175339 - ইসলাম ধর্ম সঠিক হওয়ার পক্ষে প্রমাণাদি

প্রশ্ন

আমি একজন প্রকৃত মুসলিম হতে চাই। তাই আমি এ প্রশ্নটি করছি: ইসলাম মানার আবশ্যকতা কি? অন্য কথায়: ধরুন, আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের যামানায় ছিলাম। আমি শুনেছি যে, তিনি এই ধর্মের দিকে ডাকছেন। কোন জিনিস আমাকে ধাবিত করবে যে, আমি তাঁকে রাসূল হিসেবে বিশ্বাস করব এবং তিনি যে কিতাব ও সুন্নাহ নিয়ে প্রেরিত হয়েছে সেটোতে বিশ্বাস করব? অনুরূপভাবে আমি কুরআনের এই চ্যালেঞ্জটি বুঝতে পারছি না: *"তবে তারা অনুরূপ বাণী রচনা করুক; যদি তারা সত্যবাদী হয়ে থাকে..."*। আমি যা বুঝি তা হল: কেউ যদি কোন এক শাস্ত্রে কোন একটি বই লিখে সেটি একই শাস্ত্রের অন্য একটি বইয়ের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ হয়ে থাকে; যদিও খুঁটিনাটি কিছু বিষয় ভিন্ন হোক না কেন। সুতরাং কুরআনের চ্যালেঞ্জের যৌক্তিকতা কি? কোন মুসলিমের পক্ষ থেকে এমন প্রশ্ন হয়তো কিছুটা অদ্ভুত মনে হতে পারে; কিন্তু আল্লাহ্‌ই আমার নিয়ত সম্পর্কে সম্যক অবগত।

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।.

ইসলাম ধর্ম সঠিক হওয়া ও নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সত্যতার পক্ষে দলিল-প্রমাণ অনেক। এই প্রমাণগুলো একজন নিরপেক্ষ ও একনিষ্ঠভাবে সত্যানুসন্ধী বিবেক-বুদ্ধিসম্পন্ন ন্যায়বাদী মানুষকে সন্তুষ্ট করার জন্য যথেষ্ট। এ সংক্রান্ত কিছু দলিল নিম্নে উল্লেখ করা হল:

এক: মানব প্রকৃতির দলিল: নিশ্চয় ইসলামের দাওয়াত সুস্থ মানবপ্রকৃতির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। আল্লাহ্‌তাআলার নিম্নোক্ত বাণী সে দিকেই ইশারা করছে: *"অতএব একনিষ্ঠ হয়ে নিজেকে (সঠিক) ধর্মে প্রতিষ্ঠিত কর। আল্লাহ্‌যে ফিতরতের (সৃষ্টিগত প্রকৃতির) উপর মানুষকে সৃষ্টি করেছেন সেটার উপর অটল থাক। আল্লাহ্‌র সৃষ্টিকে পরিবর্তন করো না। এটাই সঠিক ধর্ম; তবে অধিকাংশ মানুষ জানে না।"*[সূরা রূম, আয়াত: ৩০]

এবং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন: *"প্রত্যেক শিশু ফিতরতের (সুস্থ প্রকৃতির) উপর জন্মগ্রহণ করে। তার পিতামাতা তাকে ইহুদী বানায়, খ্রিস্টান বানায় কিংবা অগ্নি উপাসক বানায়। যেমনিভাবে একটি পশু শাবক নিখুঁতভাবে জন্মগ্রহণ করে; তোমরা নবজাতক পশুতে কি কোন ত্রুটি পাও?"*[সহিহ বুখারী (১৩৫৮) ও সহিহ মুসলিম (২৬৫৮)]

হাদিসের বাণী: যেমনিভাবে একটি পশু শাবক নিখুঁতভাবে জন্মগ্রহণ করে অর্থাৎ পরিপূর্ণ অঙ্গপ্রত্যঙ্গ নিয়ে ও

ত্রুটিমুক্তভাবে জন্মগ্রহণ করে। এরপর কান কাটা কিংবা অন্য যা কিছু ঘটে সেগুলো পশুটির জন্মের পরে ঘটে।

তদ্রূপ প্রত্যেকটি মানুষ ইসলামের প্রকৃতি নিয়ে জন্মগ্রহণ করে। নিঃসন্দেহে যা কিছু ইসলাম থেকে বিচ্যুতি সেটি তার প্রকৃতি থেকে দূরে সরে যাওয়া। তাই আমরা ইসলামী বিধি-বিধানে এমন কিছু পাই না যা মানবপ্রকৃতি বিরোধী। বরং ইসলামের যাবতীয় বিশ্বাস ও কর্ম সুষ্ঠু সুষম প্রকৃতির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। পক্ষান্তরে, ইসলাম ছাড়া অন্য ধর্ম ও বিশ্বাসসমূহে প্রকৃতিবিরুদ্ধ বিষয়সমূহ রয়েছে। একটু চিন্তাভাবনা ও দৃষ্টি দিলেই এটি স্পষ্টভাবে ফুটে উঠে।

দুই: বুদ্ধিভিত্তিক দলিলসমূহ

শরিয়তের অসংখ্য দলিল বিবেককে সম্বোধন করে ও বুদ্ধিগ্রাহ্য দলিল-প্রমাণগুলোকে বিবেচনা আনার উপদেশ দিয়ে উদ্ধৃত হয়েছে এবং অনেক দলিল আকলবানদের ও বুদ্ধিবানদের প্রতি ইসলামের সত্যতার পক্ষে অকাট্য দলিলগুলো অনুধাবন করার আহ্বান জানিয়ে উদ্ধৃত হয়েছে। আল্লাহ্‌তাআলা বলেন: *“এক মুবারক কিতাব, এটা আমরা আপনার প্রতি নাযিল করেছি, যাতে মানুষ এর আয়াতসমূহে তাদাব্বুর করে (গভীরভাবে চিন্তা করে) এবং যাতে বোধশক্তিসম্পন্ন ব্যক্তিরা উপদেশ গ্রহণ করে।”* [সূরা সা’দ আয়াত: ২৯]

কাযী ইয়ায কুরআনে কারীমের মোজেজার দিকগুলো তুলে ধরতে গিয়ে বলেন: “এর মধ্যে (কুরআনের মধ্যে) অন্তর্ভুক্ত হয়েছে বিধি-বিধানের জ্ঞান, বুদ্ধিবৃত্তিক প্রমাণগুলো পেশ করার পদ্ধতিসমূহ এবং অন্যান্য ধর্মের ফিরকাগুলোর বিরুদ্ধে প্রত্যুত্তর— শক্তিশালী প্রমাণ ও সুস্পষ্ট দলিলের ভিত্তিতে। যে দলিলগুলোর ভাষা সহজ, উদ্দেশ্যে সংক্ষিপ্ত। পরবর্তীতে বুদ্ধির দাবীদারেরা অনুরূপ দলিল-প্রমাণ উপস্থাপনের চেষ্টা করেও ব্যর্থ হয়েছে।”[আশ্‌শিফা (১/৩৯০)]

ওহীর দলিলগুলোতে এমন কোন বিষয় অন্তর্ভুক্ত হয়নি বিবেকের কাছে যা অসম্ভব কিংবা বিবেক যেটাকে অগ্রাহ্য করে। এমন কোন মাসয়ালা আরোপ করেনি আপাতঃ বিবেক যার বিরোধিতা করে কিংবা বুদ্ধিভিত্তিক কোন মানদণ্ড যেটার সাথে সাংঘর্ষিক। বরঞ্চ বাতিলপন্থীরা তাদের বাতিলের পক্ষে যে মানদণ্ড নিয়ে এসেছে সেটাকে সঠিক প্রমাণ ও সুস্পষ্ট বুদ্ধিবৃত্তিক বিশ্লেষণের মাধ্যমে প্রত্যাখ্যান করেছে। আল্লাহ্‌তাআলা বলেন: *“তারা আপনার কাছে যে উপমা (সংশয়) পেশ করুক না কেন আমি আপনাকে (সেটা প্রতিহত করার জন্য) সত্য দিয়েছি এবং (ওটার চেয়ে) উত্তমতর ব্যাখ্যা দিয়েছি।’”*[সূরা ফুরক্বান, আয়াত: ৩৩]

শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া (রহঃ) বলেন: “আল্লাহ্‌সুবহানাহু তাআলা সংবাদ দিচ্ছেন যে, কাফেরেরা তাদের বাতিলের পক্ষে বুদ্ধিবৃত্তিক যে মানদণ্ড নিয়ে আসুক না কেন আল্লাহ্‌তাঁকে সত্য দিয়েছেন এবং তাঁকে এমন বিশ্লেষণ, প্রমাণ ও উপমা দিয়েছেন; যা তাদের মানদণ্ডের চেয়ে সত্যকে অধিক ব্যাখ্যাকারী, উন্মোচনকারী ও স্পষ্টকারী।”[মাজমুউল ফাতাওয়া (৪/১০৬)]

কুরআনে বুদ্ধিবৃত্তিক দলিলের আরেকটি উদাহরণ হচ্ছে আল্লাহ্‌তাআলার বাণী: "তারা কি কুরআন অনুধাবন করে না; যদি এটি আল্লাহ্‌ছাড়া অন্য কারো পক্ষ থেকে আসত তাহলে তারা এতে বহু বৈপরীত্য দেখতে পেত" [সূরা নিসা, আয়াত: ৮২]

তাফসিরে কুরতুবীতে এসেছে: "প্রত্যেক যে ব্যক্তি বেশি কথা বলে তার কথাতে বৈপরীত্য পাওয়া ছাড়া গত্যন্তর নেই। সেটা তার বিবরণীতে, ভাষাতে; কিংবা তার ভাবের গুণগত মানে; কিংবা স্ববিরোধিতার ক্ষেত্রে; কিংবা মিথ্যা (অসঠিক তথ্য)-র ক্ষেত্রে। তাই আল্লাহ্‌তাআলা কুরআন নাযিল করে তাদেরকে কুরআন অনুধাবনের নির্দেশ দিলেন। কেননা তারা এতে কোন বৈপরীত্য পাবে না— না এর বিবরণীতে, না এর ভাবে, না কোন স্ববিরোধিতায়, আর না তাদেরকে অদৃশ্যের কিংবা যা কিছু তারা গোপন করে সেগুলোর যে সংবাদ দেয়া হয় সেক্ষেত্রে কোন মিথ্যা।"[আল-জামে লি আহকামিল কুরআন (৫/২৯০)]

ইবনে কাছির (রহঃ) বলেন: "অর্থাৎ যদি তা বানোয়াট ও জাল হত, যেমনটি মূর্খ মুশরিকেরা ও বর্ণচোরা মুনাফিকেরা বলে থাকে "তাহলে তারা এতে বহু বৈপরীত্য দেখতে পেত"। অর্থাৎ এটি বৈপরীত্য মুক্ত। অতএব এটি আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে নাযিলকৃত।"[তাফসিরুল কুরআনিল আযীম (১/৮০২) থেকে সমাপ্ত]

তিন: মোজেজাসমূহ ও নবুয়তের নিদর্শনাবলী:

নিশ্চয় আল্লাহ্‌তাআলা তাঁর নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে অনেক মোজেজা, অলৌকিক বিষয় এবং ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নিদর্শনাবলী দিয়ে সাহায্য করেছেন; যেগুলো তার সত্যবাদিতা ও তাঁর রিসালাতের সঠিকতার প্রমাণ বহন করে। যেমন- চন্দ্র খণ্ডিত হওয়া, তাঁর সামনে খাবার ও পাথর কণার তাসবীহ পাঠ করা, তাঁর আঙ্গুলের মাঝখান থেকে পানির প্রস্রবণ বের হওয়া, তিনি খাবারকে বাড়ানো ইত্যাদি মোজেজা ও নিদর্শনগুলো। যে মোজেজাগুলো অনেক মানুষ সচক্ষে দেখেছেন ও প্রত্যক্ষ করেছেন এবং সহিহ বর্ণনাসূত্রের মাধ্যমে যেগুলো আমাদের কাছে পৌঁছেছে। যে বর্ণনাসূত্রগুলো অর্থগত মুতাওয়াতিরের পর্যায়ভুক্ত; যা একীন তথা নিশ্চিত জ্ঞান দেয়। এর মধ্যে রয়েছে আব্দুল্লাহ্‌বিন মাসউদ (রাঃ) কর্তৃক বর্ণিত হাদিস তিনি বলেন: "একবার আমরা রাসূলুল্লাহ্‌সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে সফরে ছিলাম। তখন পানির সংকট হল। তিনি বললেন: তোমরা অবশিষ্ট কোন পানি থাকলে সেটার সন্ধান কর। তখন তারা একটি পাত্র নিয়ে এল তাতে একটু পানি ছিল। তখন তিনি পাত্রটির ভেতরে তাঁর হাত ঢুকিয়ে দিলেন। এরপর বললেন: আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে মুবারকময় পানি ও বরকত গ্রহণ করতে ছুটে আস। আমি দেখেছি, রাসূলুল্লাহ্‌সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আঙ্গুলের মাঝ থেকে পানি প্রস্রবিত হচ্ছে। তিনি আরও বলেন: যে খাবারটি খাওয়া হচ্ছে আমরা সেটার তাসবিহ পাঠ শুনতে পেতাম।"[সহিহ বুখারী (৩৫৭৯)]

চার: ভবিষ্যত বাণী:

এখানে ভবিষ্যত বাণী দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে: ভবিষ্যতে সংঘটিত হবে এমন যে সব বিষয় বা ঘটনার কথা ওহীর মাধ্যমে জানানো হয়েছে; চাই সে সব ঘটনা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জীবদ্দশায় ঘটুক কিংবা তাঁর মৃত্যুর পরে ঘটুক।

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ভবিষ্যতের যে বিষয়গুলোর কথা জানিয়েছেন সেগুলো তিনি যেভাবে বলেছেন ঠিক সেভাবেই সংঘটিত হয়েছে। এটি প্রমাণ করে যে, আল্লাহ্‌ তাঁর কাছে ওহী পাঠিয়েছেন এবং তাঁকে গায়বী কিছু বিষয় অবহিত করেছেন যে বিষয়গুলো ওহীর মাধ্যম ছাড়া জানা সম্ভবপর নয়। এ ধরণের ভবিষ্যত বাণীর মধ্যে রয়েছে:

আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: "কিয়ামত সংঘটিত হবে না যতক্ষণ পর্যন্ত না হিজাযের ভূমি থেকে একটা আগুন বের হয়; যার ফলে বসরায় অবস্থানরত উটের গলা আলোকিত হয়ে যাবে।"[সহিহ বুখারী (৭১১৮) ও সহিহ মুসলিম (২৯০২)]

এই ঘটনাটি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যে ভাবে সংবাদ দিয়েছেন ঠিক সেইভাবে ৬৫৪হিজরীতে সংঘটিত হয়েছে। অর্থাৎ তাঁর মৃত্যুর প্রায় ৬৪৪ বছর পরে। ইতিহাসবিদগণ এ বিষয়টি উল্লেখ করেছেন। যেমন- আবু শামা আল-মাকদিসি তাঁর 'যাইলুর রওযাতাইন' গ্রন্থে। তিনি এই ঐতিহাসিক ঘটনাটি সংঘটনকালীন সময়ের আলেম। অনুরূপভাবে হাফেয ইবনে কাছির তাঁর 'আল-বিদায়া ওয়ান- নিহায়া' গ্রন্থে (৩/২১৯)। তিনি বলেছেন: "এরপর ৬৫৪ সাল প্রবেশ করে। এই সালে হিজাযের ভূমি থেকে অগ্নি প্রকাশিত হয়। যার আলোতে বসরার উটের গলা আলোকিত হয়। ঠিক বুখারী-মুসলিমের হাদিসে যেভাবে উদ্ধৃত হয়েছে। এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন শাইখ ইমাম আল্লামা দ্বীনের সূর্য আবু শামা আল-মাকদিসি তাঁর 'যাইল' নামক গ্রন্থে ও উক্ত গ্রন্থের ব্যাখ্যায়। তিনি এ তথ্য লিখেছেন হিজায থেকে দামেস্কে প্রেরিত বহু পত্র থেকে। যে পত্রগুলোর সংখ্যা ছিল মুতাওয়াতির পর্যায়ে এবং এই পত্রগুলোতে এই অগ্নির প্রত্যক্ষদর্শীদের বিবরণ ও বের হওয়ার পদ্ধতি উল্লেখ ছিল।

আবু শামা যা উল্লেখ করেছেন সেটার সারমর্ম হল, তিনি বলেছেন: এই বছর ৫ জুমাদাল আখিরাতে মদিনাতে অগ্নি বের হওয়া সম্পর্কে মদিনা থেকে দামেস্কে কিছু পত্র এসেছে (মদিনাবাসীর উপর রহমত ও শান্তি বর্ষিত হোক)। ৫ ই রজবে লিখিত পত্রেও সেই আগুন বহাল থাকার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। এই পত্রটি আমাদের কাছে পৌঁছেছে ১০ ই শাবান। এরপর তিনি বলেন: বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম। ৬৫৪ হিজরীর শাবান মাসের প্রথমদিকে মদিনা থেকে লিখিত পত্র দামেস্কে পৌঁছে। উক্ত পত্রে মদিনাতে বড় একটি দুর্ঘটনা ঘটার উল্লেখ রয়েছে। যা সহিহ বুখারী ও সহিহ মুসলিমে সংকলিত আবু হুরায়রা (রাঃ)-এর হাদিসটির সত্যায়ন। আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: "কিয়ামত সংঘটিত হবে না যতক্ষণ পর্যন্ত না হিজাযের ভূমি থেকে একটা আগুন বের হয়; যার ফলে বসরায় অবস্থানরত উটের গলা আলোকিত হয়ে যাবে।" সে আগুনটি যারা সচক্ষে দেখেছেন তাদের মধ্য থেকে আমার কাছে আস্থাভাজন এমন এক ব্যক্তি জানিয়েছেন যে, তার কাছে এই মর্মে খবর পৌঁছেছে যে, তাইমা (একটি স্থানের নাম)-তে এই আগুনের আলোতে পত্র লেখা হয়েছে। তিনি আরও বলেন: "ঐ রাতগুলোতে আমরা আমাদের বাড়ীতে ছিলাম। প্রত্যেকে ঘরে চেরাগ ছিল। কিন্তু চেরাগগুলো বড় হওয়া সত্ত্বেও এগুলোর কোন উত্তাপ ও শিখা ছিল না। বরং এটি ছিল আল্লাহ্‌র একটি নিদর্শন।"[সমাপ্ত]

পাঁচ: নবীজির গুণাবলী ও বৈশিষ্ট্য:

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নবুয়তের সত্যতার অন্যতম বড় প্রমাণ হচ্ছে তাঁর ব্যক্তিত্ব এবং তিনি নিজে যে মহান চরিত্র, উত্তম স্বভাব, সুন্দর বৈশিষ্ট্য ও সুমহান গুণাবলীতে ভূষিত ছিলেন। যেহেতু নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সুমহান চরিত্র ও গুণাবলীর ক্ষেত্রে মানবীয় সর্বোচ্চ স্তরে (কামালিয়তে) পৌঁছেছিলেন; যে স্তরে পৌঁছা আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে প্রেরিত কোন নবী ছাড়া কারো পক্ষে সম্ভবপর নয়। যত প্রশংসনীয় আচরণ আছে তিনি সে দিকে আহ্বান জানিয়েছেন, সেটার নির্দেশ দিয়েছেন, সেটার প্রতি উদ্বুদ্ধ করেছেন, নিজে সেটার উপর আমল করেছেন। যত খারাপ আচরণ আছে সেগুলো থেকে তিনি নিষেধ করেছেন, সতর্ক করেছেন এবং নিজে সেটা থেকে সবচেয়ে দূরে ছিলেন। এমনকি চরিত্রের উপর তাঁর অধিক গুরুত্বারোপ এই পর্যায়ে পৌঁছেছে যে, তাঁর রিসালাত (মিশন) ও নবুয়তের দায়িত্বকে চরিত্র গঠন, সচ্চরিত্রের প্রসার এবং জাহেলী সমাজ যতটুকু চরিত্র নষ্ট করেছে সেটা সংশোধন করা হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। হাদিসে এসেছে যে, তিনি বলেন: ‘আমি সচ্চরিত্রকে পূর্ণতা দিতে প্রেরিত হয়েছি।’[মুসনাদে আহমাদ (৮৭৩৯), হাইছামী ‘আল-মাজমা’ গ্রন্থে বলেছেন: হাদিসটি আহমাদ বর্ণনা করেছেন, হাদিসটির বর্ণনাকারীগণ সহিহ হাদিসের বর্ণনাকারী। ইজলুনি তার ‘কাশফু কিফা’ গ্রন্থে হাদিসটির সনদকে সহিহ বলেছেন এবং আলবানী ‘সহিহুল জামে’ গ্রন্থে (২৩৪৯) হাদিসটিকে সহিহ বলেছেন]

মোজেজা রাসূলের সত্যতার পক্ষে প্রমাণ। কেননা তিনি মানুষকে বলবেন যে, তিনি আল্লাহ্‌তাআলার পক্ষ থেকে প্রেরিত। তখন কিছু লোক তাঁকে চ্যালেঞ্জ করে প্রমাণ দিতে বলবে। তাই আল্লাহ্‌তাঁকে মোজেজা দিয়ে সাহায্য করেন। মোজেজা হচ্ছে অলৌকিক বিষয়। আবার কারো পক্ষ থেকে চ্যালেঞ্জ বা মিথ্যায়ন না ঘটলেও মোজেজা দেয়া হতে পারে। তখন সেটা দেয়া হয় রাসূলের অনুসারীদেরকে অবিচল রাখার জন্য।

ছয়: দাওয়াতের সার নির্যাস:

নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মূল দাওয়াত শরিয়তসিদ্ধ ও সুষ্ঠু বিবেকগ্রাহ্য ভিত্তির উপর সঠিক আকিদা-বিশ্বাস বিনির্মাণের মধ্যে সংক্ষেপিত। তার বিশ্বাসগুলো হচ্ছে- আল্লাহ্‌র প্রতি ঈমানের দিকে আহ্বান, উপাসনায় (উলুহিয়্যত) ও প্রভুত্বে (রুবুবিয়্যতে) তাঁর এককত্বের প্রতি ঈমান আনার প্রতি দাওয়াত। তথা উপাসনা পাওয়ার অধিকার এক উপাস্য ছাড়া অন্য কারো নয়। আর তিনি হচ্ছেন— আল্লাহ্‌তাআলা। কেননা তিনিই হচ্ছেন— এই মহাবিশ্বের প্রভু, স্রষ্টা, মালিক, নিয়ন্ত্রণকারী, পরিচালনাকারী, নির্দেশদাতা। যিনি কল্যাণ-অকল্যাণের মালিক। যিনি সকল সৃষ্টিকুলের জীবিকার মালিক। অন্য কেউ এতে তাঁর সাথে অংশীদার নয়। তাঁর সমকক্ষ বা তাঁর অনুরূপ কেউ নেই। তিনি অংশীদার, সমকক্ষ ও সমতুল্য থেকে পবিত্র। আল্লাহ্‌তাআলা বলেন: “বলুন: তিনি আল্লাহ্, তিনি এক। আল্লাহ্: সবাই যার মুখাপেক্ষী। তিনি কাউকে জন্ম দেননি এবং তাঁকেও কেউ জন্ম দেয়নি। আর তাঁর সমকক্ষ কেউ নেই।”[সূরা আল-ইখলাছ, আয়াত ১-৪]

তিনি আরও বলেছেন: “বলুন, আমি তো তোমাদের মতই একজন মানুষ। আমার কাছে ওহী আসে যে, তোমাদের উপাস্য এক উপাস্য। অতএব, যে তার প্রভুর সাক্ষাৎ কামনা করে সে যেন সৎকাজ করে এবং তার প্রভুর ইবাদতে কাউকে অংশীদার না

করে।’[সূরা কাহাফ, আয়াত: ১১০]

অর্থাৎ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দাওয়াত হচ্ছে সব ধরণের শির্ককে নির্মূল করা এবং বাতিল যা কিছুর উপাসনা করা হয় সে সব থেকে মানুষ ও জীবনকে মুক্ত করা। পাথর-পূজা, গ্রহ-নক্ষত্র-পূজা, কবর-পূজা, সম্পদ-পূজা, প্রবৃত্তি-পূজা, বিশ্বের তাগুত ও শাসকদের পূজা; এ সব কিছুকে নাকচ করা। নিশ্চয় এটি হচ্ছে মানবজাতিকে দাসদের দাসত্ব থেকে মুক্তির দাওয়াত। তাদেরকে পৌত্তলিকতার লাঞ্ছনা থেকে, তাগুতদের অবিচার থেকে নিষ্কৃতির ডাক। কুপ্রবৃত্তি ও বেপরোয়া কামনার শৃংখল থেকে মুক্তির আহ্বান। এই মুবারকময় দাওয়াত পূর্ববর্তী তাওহীদের (একত্ববাদের) দিকে আহ্বানকারী রাসূলদের রিসালাতের সম্প্রসারণ ও সাব্যস্তকরণ হিসেবে গণ্য। এ কারণে ইসলাম সকল নবী ও রাসূলের প্রতি ঈমান আনার দিকে আহ্বান করে; তাদেরকে সম্মান করার সাথে সাথে এবং তাঁদের প্রতি অবতীর্ণ হওয়া কিতাবগুলোর প্রতি ঈমান আনার আহ্বান জানায়। এ ধরণের দাওয়াত নিঃসন্দেহে সত্য দাওয়াত।

সাত: সুসংবাদসমূহ:

পূর্ববর্তী নবীদের কিতাবসমূহ দ্বীন ইসলাম ও নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আগমনের সুসংবাদ বার্তা নিয়ে এসেছে। কুরআনে কারীম আমাদেরকে জানিয়েছে যে, তওরাত ও ইঞ্জিলে নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ব্যাপারে সুস্পষ্ট সুসংবাদ বাণীসমূহ রয়েছে। এর মধ্যে কিছু সুসংবাদে পরিস্কারভাবে তাঁর নাম ও বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ আছে। আল্লাহ্‌তাআলা বলেন: *“(এরা তো তারাই) যারা সেই রাসূল ও নিরক্ষর নবীর অনুসরণ করে যার কথা তারা তাদের তাওরাত ও ইঞ্জিলে লিখিত পাচ্ছে। তিনি তাদেরকে ভালকাজ করার আদেশ দেন ও মন্দকাজ করতে নিষেধ করেন, তাদের জন্য ভাল জিনিসকে বৈধ ও খারাপ জিনিসকে অবৈধ ঘোষণা করেন এবং তাদেরকে ভারমুক্ত ও শৃংখলমুক্ত করেন।’*[সূরা আরাফ, আয়াত: ১৫৭]

তিনি আরও বলেন: *“(স্মরণ করুন) মারয়িামের পুত্র ঈসা বলেছিলেন, ‘হে বনী ইসরাঈল! আমি তোমাদের কাছে (প্রেরিত) আল্লাহ্‌র রাসূল, আমার পূর্বে যে তাওরাত (এসেছে) সেটোকে সত্যায়নকারী এবং এমন এক রাসূলের সুসংবাদদাতা যিনি আমার পরে আসবেন, যার নাম আহমাদ।’*[সূরা আছ্‌ছফ, আয়াত: ৬]

এখনও ইহুদী ও খ্রিস্টানদের গ্রন্থসমূহে (তাওরাত ও ইঞ্জিলে) এমন কিছু সুসংবাদ বাণী বিদ্যমান যেগুলো তাঁর আগমন ও তাঁর রিসালাতের সুসংবাদ দেয় এবং তাঁর কিছু গুণাবলী তুলে ধরে; এ সুসংবাদগুলো মুছে ফেলার ও বিকৃত করার অবিরাম প্রচেষ্টা সত্ত্বেও। দ্বিতীয় বিবরণী (৩৩:২) তে এসেছে: “প্রভু সীনয় পর্বত হতে এলেন, সেয়ীরের গোধূলি বেলায় যেন আলো উদিত হল। পারাণ পর্বত হতে যেন আলো জ্বলে উঠলো।”

মুজামুল বুলদান গ্রন্থে (৩/৩০১) এসেছে: ‘পারাণ’ একটি হিব্রু শব্দ। যেটোকে আরবীকরণ করা হয়েছে। এটি মক্কার একটি নাম; যা তাওরাতে উল্লেখিত হয়েছে। কারো মতে, এটি মক্কার একটি পাহাড়ের নাম।

ইবনে মাকুলা বলেন:

বকরের পিতা, নাসর বিন আল-কাসেম বিন কুযাআ আল-কুযাঈ, আল-পারাণী, আল-ইসকান্দারানী: আমি শুনেছি যে এটি (আল-পারানী) পারণ নামক পাহাড়ের দিকে সম্বন্ধীয়। আর এটি হচ্ছে হিজাযের একটি পাহাড়।

তাওরাতে এসেছে:

“সদাপ্রভু সীনয় থেকে আসিলেন, সেয়ীর হইতে তাহাদের প্রতি উদিত হইলেন; পারাণ পর্বত হইতে আপন তেজ প্রকাশ করিলেন”।

এখানে সীনয় থেকে আসা মানে মুসা আলাইহিস সালামের সাথে কথা বলা। সেয়ীর থেকে উদিত হওয়া: সেয়ীর ফিলিস্তিনের কিছু পাহাড়। উক্তির মানে হচ্ছে- ঈসা আলাইহিস সালামের প্রতি ইঞ্জিল নাযিল করা। পারাণ পর্বত হতে আপন তেজ প্রকাশ মানে: মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহিস সালামের উপর কুরআন নাযিল করা।[সমাপ্ত]

আট: কুরআনুল কারীম:

এটি হচ্ছে সবচেয়ে বড় মোজেজা এবং সর্বাধিক সুস্পষ্ট প্রমাণ। কিয়ামত পর্যন্ত এটি সৃষ্টির উপর আল্লাহ্‌তাআলার চূড়ান্ত প্রমাণ। এ কুরআনে চ্যালেঞ্জের কয়েকটি দিক সন্নিবেশিত হয়েছে: ভাষাগত চ্যালেঞ্জ, জ্ঞানগত চ্যালেঞ্জ, আইনপ্রণয়ন বিষয়ক চ্যালেঞ্জ এবং ভবিষ্যত ও অদৃশ্য বিষয়াবলীর সংবাদ প্রদান।

পক্ষান্তরে, *“তবে তারা অনুরূপ বাণী রচনা করুক; যদি তারা সত্যবাদী হয়ে থাকে...”।* [সূরা তুর, আয়াত: ৩৪] এ বাণীর দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে যারা দাবী করছে যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কুরআনকে নিজের পক্ষ থেকে বানিয়ে বলছেন তাদের কথাকে খণ্ডন করা। কুরআন তাদেরকে অনুরূপ বাণী রচনা করার চ্যালেঞ্জ দিয়েছে; যদি তারা তাদের দাবীতে সত্যবাদী হয়। কেননা তাদের এ দাবী অনিবার্য করে যে, এটি মানুষের সক্ষমাধীন। যদি তা সঠিক হয় তাহলে কোন জিনিস তাদেরকে অনুরূপ বাণী রচনায় বাধা দিচ্ছে যে, তারা সেটা করতে অপারগ। অথচ তারা হচ্ছে বাগ্মী এবং অলংকার শাস্ত্রের বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ। আল্লাহ্‌রাব্বুল আলামীন কাফেরদের প্রতি অনুরূপ বাণী রচনা করে আনার চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিয়েছেন; যেমনটি কুরআনে এসেছে: *“বলুন, মানুষ ও জিনেরা যদি এই কুরআনের অনুরূপ কোন গ্রন্থ তৈরী করার জন্য একত্রিত হয় এবং একে অপরকে সাহায্য করে তবুও তারা এর অনুরূপ গ্রন্থ তৈরী করতে পারবে না।”*[সূরা আল-ইসরা, আয়াত: ৮৮]

তিনি তাদেরকে অনুরূপ দশটি সূরা রচনা করার চ্যালেঞ্জও দিয়েছেন; যা গ্রহণ করতে তারা ব্যর্থ হয়েছে। কুরআনে এসেছে: *“নাকি তারা বলে যে, এই কুরআন সে (মুহাম্মদ) নিজে বানিয়েছে? বলুন, যদি তোমরা সত্যবাদী হও তাহলে তোমরাও এর অনুরূপ দশটি সূরা বানিয়ে আন এবং (এ কাজে সাহায্যের জন্য) আল্লাহ্‌ছাড়া যাকে পার ডেকে লও।”*[সূরা হুদ, আয়াত: ১৩]

তাদেরকে অনুরূপ একটি সূরা রচনার চ্যালেঞ্জও দেয়া হয়েছে; যা গ্রহণ করতে তারা ব্যর্থ হয়েছে। কুরআনে এসেছে: ‘আর আমি আমার বান্দার ওপর যা নাযিল করেছি *(অর্থাৎ কুরআন)* সে সম্বন্ধে যদি তোমাদের কোন সন্দেহ থাকে তাহলে *(নিজেরা)* তার আদলে একটি সূরা রচনা করে দেখাও এবং আল্লাহ্‌ব্যতীত তোমাদের সাক্ষীদেরকে *(অথবা সাহায্যকারীদেরকে)* ডাক*;* যদি তোমরা সত্যবাদী হও*।’*[সূরা বাক্বারা, আয়াত: ২৩]

কুরআন রচনা করতে না পারার যে চ্যালেঞ্জ দেয়া হয়েছে সেটা কোন বিবেচনা থেকে এ ব্যাপারে আলেমগণ একাধিক মত পেশ করেছেন। সর্বাধিক ভাস্বর অভিমত হচ্ছে যা আলুসী বলেছেন: “সমগ্র কুরআন কিংবা এর অংশ বিশেষ এমনকি সেটা ছোট্ট একটি সূরাও যদি হয় এর দ্বারা চ্যালেঞ্জ দেয়া হয়েছে— এর বিন্যাস, ভাষাগত অলংকরণ, অদৃশ্যের সংবাদ প্রদান, বিবেক-বুদ্ধি ও সূক্ষ্ম মর্মের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হওয়ার দিক থেকে। কখনও এ সবগুলো বিষয় এক আয়াতের মধ্যেই ফুটে ওঠে। আবার কখনও কিছু বিষয় প্রচ্ছন্ন থাকতে পারে; যেমন অদৃশ্যের সংবাদ দানের বিষয়টি। এতে দোষের কিছু নেই। যতটুকু অটুট আছে ততটুকুই যথেষ্ট এবং উদ্দেশ্য হাছিলের জন্য পর্যাপ্ত।”[রুহুল মাআনী (১/২৯) থেকে সমাপ্ত]

পূর্বোক্ত প্রত্যেকটি সামগ্রিক সূত্রের অধীনে অনেক বিস্তারিত দলিল রয়েছে। কিন্তু, এখানে সেগুলো আলোচনা করার যথেষ্ট সুযোগ নেই। বরং যথাযথ স্থান থেকে সেগুলো জেনে নেয়াটাই ভাল। প্রত্যেক মুসলিমের প্রতি উপদেশ হচ্ছে— কুরআন-হাদিসের জ্ঞান অর্জন করা, সহিহ আকিদার বই-পুস্তক পড়া, দ্বীনি বিষয় জানা; যাতে করে ব্যক্তির ইসলাম সুশোভিত হয় এবং ইলমের ভিত্তিতে সে তার প্রভুর ইবাদত করতে পারে।

আল্লাহ্‌ই সর্বজ্ঞ।